أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

আসসালামু’আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا كُتِبَ عَلَيۡكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيۡنَ مِنۡ قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُوۡنَ ২:১৮৩

১৮৩. হে মুমিনগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের বিধান দেয়া হল, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববতীদেরকে দেয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা তাকওয়ার অধিকারী হতে পারত

اَيَّامًا مَّعۡدُوۡدٰتٍ‌ؕ فَمَنۡ كَانَ مِنۡكُمۡ مَّرِيۡضًا اَوۡ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنۡ اَيَّامٍ اُخَرَ‌ؕ وَ عَلَى الَّذِيۡنَ يُطِيۡقُوۡنَهٗ فِدۡيَةٌ طَعَامُ مِسۡكِيۡنٍ‌ؕ فَمَنۡ تَطَوَّعَ خَيۡرًا فَهُوَ خَيۡرٌ لَّهٗ‌ؕ وَ اَنۡ تَصُوۡمُوۡا خَيۡرٌ لَّكُمۡ اِنۡ كُنۡتُمۡ تَعۡلَمُوۡنَ ২:১৮৪

এগুলো গোনা কয়েক দিন। অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে বা সফরে থাকলে অন্য দিনগুলোতে এ সংখ্যা পূরণ করে নিতে হবে। আর যাদের জন্য সিয়াম কষ্টসাধ্য তাদের কর্তব্য এর পরিবর্তে ফিদইয়া- একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করা। যদি কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎকাজ করে তবে তা তার জন্য কল্যাণকর। আর সিয়াম পালন করাই তোমাদের জন্য অধিকতর কল্যাণের যদি তোমরা জানতে।

صومএর শব্দিক অর্থ বিরত থাকা। শরীআতের পরিভাষায় আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্যে পানাহার এবং স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকার নাম ‘সাওম’। তবে সুবহে সাদিক উদয় হওয়ার পূর্ব থেকে শুরু করে সূর্যস্ত পর্যন্ত সিয়ামের নিয়াতে একাধারে এভাবে বিরত থাকলেই তা সিয়াম বলে গণ্য হবে।

তাকওয়ার মূল ধাতুর অর্থ বাঁচা, মুক্তি বা নিষ্কৃতি।
তাকওয়ার আভিধানিক অর্থ হল ভয় করা, পরহেযগারী, বিরত থাকা।
মূলত তাকওয়া শুধু আল্লাহভীতি নয় বরং আল্লাহ সম্পর্কে সেই রকম সচেতনতা(যা তাঁর আসমা ওয়াস সিফাতকে জানা বুঝা ও নিজ জীবনে প্রতিফলন করা)) রাখা, যার ফলে গুনাহ থেকে সরে থাকা ও কল্যান কাজে লিপ্ত থাকা যায়, মহান আল্লাহ যা আদেশ করেছেন এবং যে পদ্ধতিতে করতে বলেছেন তার অনুসরন(রাসুল সা এর আদর্শ) করা।
শরিয়তের পরিভাষায়, আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে আল্লাহ তা’লার সকল আদেশ মানা এবং নিষিদ্ধ কাজ থেকে দূরে থাকার নাম তাকওয়া।

ইসলাম বা আল-কুর'আনের আলোকে যেটা প্রকৃত মুক্তি, নিষ্কৃতি বা পরিত্রাণ নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য সেই মুক্তি/নিষ্কৃতিই তাকওয়ার আওতায় পড়বে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ ۗ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

কাজেই তোমাদের মধ্যে যতটা সম্ভব হয় আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। আর শুন ও অনুসরণ কর এবং নিজের ধন-মাল ব্যয় কর, এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। যে লোক স্বীয় মনের সংকীর্ণতা ও কৃপনতা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারবে তারাই সফলকাম হবে। সূরা আত তাগাবুন: ১৬

হে মানুষ! আমরাই তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রী হতে সৃষ্টি করেছি। তারপর তোমাদের মধ্যে জাতি ও ভাতৃগোষ্ঠী বানিয়ে দিয়েছি, যেন তোমরা পরস্পরকে চিনতে পারো। নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে সর্বাধিক সম্মানিত সে, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবকিছু জানেন এবং সব বিষয়ে অবহিত। সূরা আল হুজুরাত: ১৩

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ

আর যে ব্যক্তি নিজের রবের সামনে এসে দাঁড়াবার ব্যাপারে ভীত ছিল এবং নফ্সকে খারাপ কামনা থেকে বিরত রেখেছিল তার ঠিকানা হবে জান্নাত। সূরা আন নাযিয়াত: ৩৫-৪১

আর তাই মহান আল্লাহ ঈমানদের সম্বোধন করে আহবান করেছেন:
হে ঈমানদারগণ! তোমরা যথাযথভাবে আল্লাহকে ভয় করো। মুসলিম থাকা অবস্থায় ছাড়া যেন তোমাদের মৃত্যু না হয়। সূরা আলে ইমরান: ১০২
তাকওয়া মানুষের মধ্যে ন্যায়-অন্যায় ও সত্য-মিথ্যা পার্থক্য করার শক্তি জাগ্রত করে। আল্লাহ তাআলা এ প্রসঙ্গে বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّ يُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ

হে বিশ্বাসীগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তাহলে তিনি তোমাদেরকে ন্যায়-অন্যায় পার্থক্যকারী শক্তি দেবেন, তোমাদের পাপ মোচন করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ অতিশয় অনুগ্রহশীল। সূরা আনফালঃ ২৯
"অর্থাৎ তাকওয়ার ফলে মানুষের বিবেক বুদ্ধি প্রখর হয় এবং সুষ্ঠ বিচার-বিবেচনা শক্তি জাগ্রত হয়। তাই সে সত্য-মিথ্যা ন্যায়-অন্যায় ও ভাল-মন্দ চিনতে এবং তা অনুধাবন করতে ভূল করে না।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ وَ يَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

হে মুমিনগণ! আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং তার রাসূলের উপর ঈমান আন। তিনি তার অনুগ্রহে তোমাদেরকে দেবেন দ্বিগুণ পুরস্কার এবং তিনি তোমাদেরকে দেবেন নূর, যার সাহায্যে তোমরা চলবে। এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। সূরা হাদীদঃ ২৮

شَهۡرُ رَمَضَانَ الَّذِیۡۤ اُنۡزِلَ فِیۡهِ الۡقُرۡاٰنُ هُدًی لِّلنَّاسِ وَ بَیِّنٰتٍ مِّنَ الۡهُدٰی وَ الۡفُرۡقَانِ ۚ فَمَنۡ شَهِدَ مِنۡکُمُ الشَّهۡرَ فَلۡیَصُمۡهُ ؕ وَ مَنۡ کَانَ مَرِیۡضًا اَوۡ عَلٰی سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنۡ اَیَّامٍ اُخَرَ ؕ یُرِیۡدُ اللّٰهُ بِکُمُ الۡیُسۡرَ وَ لَا یُرِیۡدُ بِکُمُ الۡعُسۡرَ ۟ وَ لِتُکۡمِلُوا الۡعِدَّةَ وَ لِتُکَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰی مَا هَدٰىکُمۡ وَ لَعَلَّکُمۡ تَشۡکُرُوۡنَ

রমাদান মাস, এতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের হেদায়াতের জন্য এবং হিদায়তের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে এ মাস পাবে সে যেন এ মাসে সিয়াম পালন করে। তবে তোমাদের কেউ অসুস্থ থাকলে বা সফরে থাকলে অন্য দিনগুলোতে এ সংখ্যা পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ চান এবং তোমাদের জন্য কষ্ট চান না। আর যাতে তোমরা সংখ্যা পূর্ণ কর এবং তিনি তোমাদেরকে যে হিদায়াত দিয়েছেন সে জন্য তোমরা আল্লাহর মহিমা ঘোষণা কর এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। বাকারাঃ১৮৫

وَ اِذَا سَاَلَکَ عِبَادِیۡ عَنِّیۡ فَاِنِّیۡ قَرِیۡبٌ ؕ اُجِیۡبُ دَعۡوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ۙ فَلۡیَسۡتَجِیۡبُوۡا لِیۡ وَ لۡیُؤۡمِنُوۡا بِیۡ لَعَلَّهُمۡ یَرۡشُدُوۡنَ ﴿۱۸۶﴾

আর আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞেস করে, (তখন বলে দিন যে) নিশ্চয় আমি অতি নিকটে। আহবানকারী যখন আমাকে আহবান করে আমি তার আহবানে সাড়া দেই। কাজেই তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমার প্রতি ঈমান আনুক, যাতে তারা সঠিক পথে চলতে পারে। বাকারাঃ ১৮৬

اُحِلَّ لَکُمۡ لَیۡلَةَ الصِّیَامِ الرَّفَثُ اِلٰی نِسَآئِکُمۡ ؕ هُنَّ لِبَاسٌ لَّکُمۡ وَ اَنۡتُمۡ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ؕ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّکُمۡ کُنۡتُمۡ تَخۡتَانُوۡنَ اَنۡفُسَکُمۡ فَتَابَ عَلَیۡکُمۡ وَ عَفَا عَنۡکُمۡ ۚ فَالۡـٰٔنَ بَاشِرُوۡهُنَّ وَ ابۡتَغُوۡا مَا کَتَبَ اللّٰهُ لَکُمۡ ۪ وَ کُلُوۡا وَ اشۡرَبُوۡا حَتّٰی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الۡخَیۡطُ الۡاَبۡیَضُ مِنَ الۡخَیۡطِ الۡاَسۡوَدِ مِنَ الۡفَجۡرِ ۟ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّیَامَ اِلَی الَّیۡلِ ۚ وَ لَا تُبَاشِرُوۡهُنَّ وَ اَنۡتُمۡ عٰکِفُوۡنَ ۙ فِی الۡمَسٰجِدِ ؕ تِلۡکَ حُدُوۡدُ اللّٰهِ فَلَا تَقۡرَبُوۡهَا ؕ کَذٰلِکَ یُبَیِّنُ اللّٰهُ اٰیٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ یَتَّقُوۡنَ

সিয়ামের রাতে তোমাদের জন্য স্ত্রী-সম্ভোগ বৈধ করা হয়েছে। তারা তোমাদের পোষাকস্বরুপ এবং তোমরাও তাদের পোষাকস্বরুপ। আল্লাহ জানেন যে, তোমরা নিজদের সাথে খিয়নত কর ছিলে। সুতরাং তিনি তোমাদের তাওবা কবুল করেছেন এবং তোমাদেরকে মার্জনা করেছেন। কাজেই এখন তোমরা তাদের সাথে সংগত হও এবং আল্লাহ যা তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন তা কামনা কর। আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ রাতের কালোরেখা থেকে উষার সাদা রেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রকাশ না হয়। তারপর রাতের আগমন পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ কর। আর তোমরা মসজিদে ইতিকাফরত অবস্থায় তাদের সাথে সংগত হয়ো না। এগুলো আল্লাহর সীমারেখা। কাজেই এগুলোর নিকটবর্তী হয়ে না। এভাবে আল্লাহ তার আয়াতসমূহ মানুষদের জন্য সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাতে তারা তাকওয়ার অধিকারী হতে পারে। বাকারাঃ১৮৭

রামাদান কুর’আন নাযিলের মাস

মহান আল্লাহ তা’লা বলেছেন, কোরআন পাওয়ার ফলে আমাদের আনন্দ করা প্রয়োজন।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾

হে মানুষ! তোমাদের কাছে তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে নসীহত (বিশিষ্ট কিতাব) এসেছে, মানুষের অন্তরে যে সব ব্যাধি রয়েছে, (এটা) তার প্রতিকার এবং মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত। হে নবী, বলুন, মানুষের উচিত আল্লাহর এই অনুগ্রহ ও রহমতের কারণে আনন্দ প্রকাশ করা, কারণ এটা সেই সব জিনিষ হতে উত্তম তারা যা কিছু (জ্ঞান ও সম্পদ) জমা করেছে। সূরা ইউনুস: ৫৭-৫৮

আল্লাহ তা’লা বলেছেন:

অতঃপর আমার নিকট থেকে যে জীবন বিধান তোমাদের নিকট পৌঁছুবে যারা আমার সে বিধান মেনে চলবে তাদের জন্য কোন চিন্তা ও ভাবনার কোন কারণ থাকবে না। সূরা আল বাকারা: ৩৮

(এই) সেই (মহান) গ্রন্থ আল কুর’আন তাতে কোন সন্দেহ নেই, যারা আল্লাহ তা’লাকে ভয় করে, এই কিতাব তাদের জন্যই ভয় প্রদর্শক। সূরা আল বাকারা: ২

তোমাদের কাছে আল্লাহর কাছ থেকে রৌশনী এসেছে, এমন একখানি সত্য প্রদর্শনকারী কিতাব যা দিয়ে আল্লাহ তা’লা তাঁর সন্তোষ সন্ধানকারী লোকদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তার পথ বলে দেন এবং নিজ অনুমতিক্রমে তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে যান এবং সঠিক পথে তাদেরকে পরিচালিত করেন।সূরা আল মায়িদা: ১৫-১৬

আমরা এই কুর’আনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ মাধ্যম বানিয়েছি। এ হতে উপদেশ গ্রহণের কেউ আছে কি? সূরা আল ক্বামার: ১৭

রমযান মাসে কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার অর্থ এই নয় যে, কোন এক রমযানে পূর্ণ কুরআনকে নাযিল করে দেওয়া হয়েছে; বরং এর অর্থ এই যে, রমযানের কদরের রাতে ‘লাওহে মাহফূয’ থেকে নিকটের আসমানে পূর্ণ কুরআন একই সাথে অবতীর্ণ করা হয় এবং সেখানে ‘বায়তুল ইয্যাহ’তে রেখে দেওয়া হয়। ওখান থেকে ২৩ বছরের নবুঅতী জীবনে প্রয়োজনের তাকীদে এবং অবস্থা অনুপাতে কিছু কিছু করে অবতীর্ণ হতে থাকে। (ইবনে কাসীর) সুতরাং এ রকম বলা যে, কুরআন রমযান মাসে অথবা কদরের রাতে কিংবা পবিত্র বা বরকতময় রাতে অবতীর্ণ হয়েছে, সবই সঠিক। কারণ, ‘লাউহে মাহফূয’ থেকে তো রমযান মাসেই নাযিল করা হয়েছে। সূরা বুরুজ(২১-২২) ইরশাদ হয়েছে--

﴿بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ

(তোমার মিথ্যা আরোপ করায় এ কুরআনের কিছু আসে যায় না।)

فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ﴾

বরং এ কুরআন উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন , সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ।

রমাদান মাসের লক্ষ্যনীয়ঃ

১। আল্লাহ তাআলা এ মাসে রোজা পালন করাকে ইসলামের চতুর্থ রুকন হিসেবে নির্ধারণ করেছেন।
২। এই মাসে কুরআন নাযিল করেছেন।
৩। আল্লাহতাআলা এ মাসে লাইলাতুল কদর বা ভাগ্য রজনী রেখেছেন। যে রাত্রি হাজার মাসের চেয়ে উত্তম।
৪। আল্লাহ তাআলা এই মাসে ঈমান সহকারে ও প্রতিদানের আশায় সিয়াম ও ক্বিয়ামপালন (রোজা ও নামাজ আদায়) করাকে গুনাহ মাফের কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।
৫.আল্লাহ তাআলা এই মাসে জান্নাতগুলোর দরজা খোলা রাখেন, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ রাখেন এবং শয়তানদেরকে শেকলবদ্ধ করেন।
৬. এমাসের প্রতিরাতে আল্লাহ জাহান্নাম থেকে তাঁর বান্দাদের মুক্ত করেন।
৭. রমজান মাসে সিয়াম পালন পূর্ববর্তী রমজান থেকে কৃত গুনাহসমূহকে মিটিয়ে দেয়; যদি কবিরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা হয়
৮. এই মাসে সিয়াম পালন বছরের দশমাস সিয়াম পালন তুল্য।
৯. এই মাসে যে ব্যক্তি ইমামের সাথে ইমাম যতক্ষণ নামায পড়েন ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামুল লাইল (তারাবী নামায) আদায় করবে সে ব্যক্তি সারা রাত নামায পড়ার সওয়াব পাবে।
১০. এই মাসে উমরা আদায় করা হজ্জ করার সমতুল্য।
১১. এ মাসে ইতিকাফ করা সুন্নত।
১২. রমজান মাসে পারস্পারিক কুরআন তেলাওয়াত ও ব্যক্তিগতভাবে বেশি বেশি তেলাওয়াত করা তাগিদপূর্ণ মুস্তাহাব্ব।
১৩. রমজান মাসে রোজাদারকে ইফতার খাওয়ানো মুস্তাহাব্ব।
১৪। ‘‘আল্লাহ তাআলা বলেন:রোজা আমার-ই জন্য, আমিই এর প্রতিদান দিব।সহিহ বুখারী (৭৪৯২) ও সহিহ মুসলিম (১১৫১)]

রোযার কিছু সুন্নত

এক:

যদি কেউ রোযাদারকে গালি দেয় কিংবা তার সাথে ঝগড়া করতে আসে তাহলে রোযাদার তার দুর্ব্যবহারের জবাব ভাল ব্যবহার দিয়ে বলবে: 'নিশ্চয় আমি রোযাদার'।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "সিয়াম হচ্ছে ঢালস্বরূপ। অতএব, কেউ যেন মন্দ কথা না বলে, মূর্খ আচরণ না করে। যদি কোন লোক তার সাথে ঝগড়া করে কিংবা তাকে গালি দেয় তাহলে সে যেন বলে দেয়, আমি রোযাদার, আমি রোযাদার। ঐ সত্তার শপথ যার হাতে রয়েছে আমার প্রাণ, নিশ্চয় রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ্ তাআলার কাছে মিসকের ঘ্রাণের চেয়ে উত্তম। (আল্লাহ্ বলেন) আমার কারণে সে পানাহার ও যৌনসুখ বর্জন করেছে। রোযা আমারই জন্য। আমিই রোযার প্রতিদান দিব। এক নেকীর প্রতিদানে দশ নেকী দিব।"[সহিহ বুখারী (১৮৯৪) ও সহিহ মুসলিম (১১৫১)]

দুই:

রোযাদারের জন্য সেহেরী খাওয়া সুন্নত। সহিহ বোখারী ও সহিহ মুসলিমে আনাস বিন মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমরা সেহেরী খাও; কারণ সেহেরীতে বরকত রয়েছে।"[সহিহ বুখারী (১৯২৩) ও সহিহ মুসলিম (১০৯৫)]

তিন:

বিলম্বে সেহেরী খাওয়া সুন্নত। দলিল হচ্ছে, সহিহ বুখারীতে আনাস (রাঃ) যায়েদ বিন সাবেত (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন: আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সেহেরী খেলাম। এরপর তিনি নামাযে দাঁড়ালেন। আমি বললাম: আযান ও সেহেরী মাঝে কতটুকু সময় ছিল? তিনি বলেন: পঞ্চাশ আয়াত তেলাওয়াত করার সমান সময়।"সহিহ বুখারী (১৯২১)]

চার:

অবিলম্বে ইফতার করা সুন্নত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: "মানুষ ততদিন পর্যন্ত কল্যাণে থাকবে, যতদিন তারা অবিলম্বে ইফতার করে।"সহিহ বুখারী (১৯৫৭) ও সহিহ মুসলিম ১০৯৮

পাঁচ:

কাঁচা খেজুর দিয়ে ইফতার করা সুন্নত। যদি কাঁচা খেজুর না পাওয়া যায় তাহলে শুকনো খেজুর দিয়ে। যদি শুকনো খেজুরও না থাকে তাহলে পানি দিয়ে। আনাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদিস তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায পড়ার আগে কয়েকটি কাঁচা খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। যদি কাঁচা খেজুর না থাকত তাহলে শুকনো খেজুর দিয়ে। যদি শুকনো খেজুরও না থাকত, তাহলে কয়েক ঢোক পানি দিয়ে।"।[সুনানে আবু দাউদ (২৩৫৬), সুনানে তিরমিযি (৬৯৬), 'ইরওয়াউল গালিল' গ্রন্থে ৪/৪৫ হাদিসটিকে 'হাসান' বলা হয়েছে]

ছয়:

হাদিসে যা বর্ণিত হয়েছে সেটা বলে ইফতার করা সুন্নত। হাদিসে এসেছে 'বিসমিল্লাহ্' বলে ইফতার করা। সঠিক মতানুযায়ী 'বিসমিল্লাহ্' বলা ওয়াজিব; আরও বর্ণিত হয়েছে, "আল্লাহুম্মা লাকা ছুমতু, ওয়া আলা রিযকিকা আফতারতু। আল্লাহুম্মা তাকাব্বাল মিন্নি ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম।" (অর্থ- হে আল্লাহ্, আপনার জন্যই রোযা রেখেছি এবং আপনার দেয়া রিযিক দিয়ে ইফতার করেছি। হে আল্লাহ্, আমার পক্ষ থেকে আপনি কবুল করে নিন। নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী।)।[ইবনুল কাইয়্যেম তাঁর 'যাদুল মাআদ' গ্রন্থে (২/৫১) বলেছেন, হাদিসটি দুর্বল] "যাহাবায যামাউ, ওয়াবতাল্লাতিল উরুকু ওয়া সাবাতাল আজরু, ইনশাআল্লাহ্" (অর্থ- তৃষ্ণা দূরীভুত হল, শিরাগুলো সিক্ত হল এবং ইনশাআল্লাহ্, সওয়াব সাব্যস্ত হল)।[সুনানে আবু দাউদ (২৩৫৭), সুনানে বাইহাকী (৪/২৩৯), 'ইরওয়াউল গালিল' গ্রন্থে (৪/৩৯) হাদিসটিকে 'হাসান' আখ্যায়িত করা হয়েছে]

আবু উমাম (রাঃ) থেকে মারফু হাদিস হিসেবে বর্ণিত হয়েছে যে, “প্রতিদিন ইফতারের সময় আল্লাহ্ কিছু মানুষকে (জাহান্নাম থেকে) মুক্ত করে দেন” [মুসানদে আহমাদ (২১৬৯৮), আলবানী ‘সহিহুত তারগীব’ গ্রন্থে হাদিসটিকে ‘সহিহ’ আখ্যায়িত করেছেন]

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে মারফু হাদিস হিসেবে বর্ণিত হয়েছে যে, নিশ্চয় প্রতিটি দিন ও রাতে আল্লাহ্ কিছু মানুষকে (জাহান্নাম থেকে) মুক্ত করেন; অর্থাৎ রমযান মাসে। নিশ্চয় প্রতিটি দিন ও রাতে প্রত্যেক মুসলিমের জন্য একটি কবুলযোগ্য দোয়া রয়েছে।” [হাদিসটি ‘বায্যার’ বর্ণনা করেছেন; আলবানী ‘সহিহুত তারগীব’ গ্রন্থে (১/৪৯১) হাদিসটিকে সহিহ আখ্যায়িত করেছেন

“জিবরীল আলাইহিস সালাম প্রতি বছর আমাকে একবার কুরআন পড়ে শুনাতেন। এ বছর তিনি তা আমাকে দু’বার পড়ে শুনিয়েছেন”। সহীহ মুসলিম: ২৪৫০

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমার থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও জিবরীল পরস্পর রাতের বেলায় কুরআন পড়ে শুনাতেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধন-সম্পদ ব্যয় করার ব্যাপারে সকলের চেয়ে দানশীল ছিলেন। রমযানে জিবরীল আলাইহিস সালাম যখন তাঁর সাথে দেখা করতেন, তখন তিনি আরো অধিক দান করতেন। রমযানের প্রতি রাতেই জিবরীল আলাইহিস সালাম তাঁর সাথে একবার সাক্ষাৎ করতেন। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে কুরআন শোনাতেন। জিবরীল আলাইহিস সালাম যখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন তখন তিনি রহমত প্রেরিত বায়ূর চেয়ে অধিক ধন-সম্পদ দান করতেন” সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৯০২।

“কিয়ামতের দিন কুরআন ওয়ালা যখন সে কবর থেকে উত্থিত হবে তখন কুরআন তার সাথে ফ্যাকাশে রঙ্গ অবস্থায় মিলিত হয়ে বলবে, তুমি কি আমাকে চেন? সে বলবে, আমি তো আপনাকে চিনি না। তখন কুরআন বলবে, আমি তোমার সাথী কুরআন যে তোমাকে দিনের বেলায় (দ্বিপ্রহরে) তৃষ্ণার্ত রেখেছে এবং রাতের বেলায় জাগিয়ে রেখেছে। আজ প্রত্যেক ব্যক্তি তার পশ্চাতে পাঠানো ফলাফল পাবে। আজ তোমার ব্যবসার ফলাফল গ্রহণ করো। তখন তার ডানে রাজত্ব ও বামে জান্নাতুল খুলদ দেওয়া হবে। তার মাথায় সম্মানের মুকুট পরিয়ে দেওয়া হবে এবং তার পিতামাতাকে দু’টি চাদর পরিধান করানো হবে যার মূল্য দুনিয়াবাসীরা দিতে পারবে না। তারা বলবেন, আমাদেরকে কিসের বিনিময়ে এ চাদর পরিধান করা হলো? তাদেরকে বলা হবে, আপনাদের সন্তানকে কুরআন শিক্ষা দেওয়ার জন্য। অতঃপর তাকে (কুরআনধারী) বলা হবে, তুমি কুরআন পড়তে থাকো আর জান্নাতের এক একটি স্তর ও রুমে উঠতে থাকো। সে যতক্ষণ কুরআন পড়তে থাকবে ততক্ষন উপরে উঠতে থাকবে, চাই সে দ্রুত তিলাওয়াত করুক বা তারতীলের সাথে ধীরে ধীরে তিলাওয়াত করুক।” মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং ২২৯৫০। শু‘আইব আরনাঊত হাদীসটির সনদকে মুতাবা‘আত ও শাওয়াহেদের ভিত্তিকে হাসান বলেছেন।

রোজাকালে ও রোজা ছাড়া, দিবসের প্রথমভাগে অথবা শেষভাগে সবসময় মিসওয়াক করা মুস্তাহাব। দলিল হচ্ছে-

১- ইমাম বুখারি (নং ৮৮৭) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যদি আমি আমার উম্মতের জন্য কঠিন মনে না করতাম তাহলে তাদেরকে প্রত্যেক নামাযের সময় মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।"

২- ইমাম নাসাঈ, আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "মিসওয়াক হচ্ছে- মুখ পবিত্রকারী ও রব্বকে সন্তুষ্টকারী"[নাসাঈ (৫), আলবানী সহিহ নাসাঈ গ্রন্থে (৫) হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন]

এ হাদিসগুলোত সবসময় মিসওয়াক করা মুস্তাহাব হওয়ার পক্ষে দলিল পাওয়া যায়। এ বিধান থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোজাদারকে বাদ দেননি। বরং হাদিসগুলো রোজাদার ও রোজাদার নয় এমন সকলকে শামিল করে।

মিসওয়াক করার পর থুথু গিলে ফেলা জায়েয। তবে যদি মিসওয়াকের কোন কিছু ছুটে মুখে থাকে তাহলে সেটা ফেলে দিয়ে থুথু গিলে ফেলবে। যেমন রোজাদারের জন্য ওজু করা জায়েয। ওজুর পানি মুখ থেকে ফেলে দিয়ে থুথু গিলে ফেলা জায়েয। কুলির পানি মুখ থেকে শুকিয়ে ফেলা আবশ্যকীয় নয়।

ইমাম নববী 'আল-মাজমু' (৬/৩২৭) কিতাবে বলেন:

মুতাওয়াল্লি ও অন্যান্যরা বলেন: "রোজাদার কুলি করার পর কুলির পানি ফেলে দেয়া অপরিহার্য। কোন কাপড় বা এ জাতীয় কিছু দিয়ে মুখ শুকানো অপরিহার্য নয়- এ ব্যাপারে কোন মতপার্থক্য নেই।" সমাপ্ত

ইবনে হাজার ফাতহুল বারী গ্রন্থে বলেন:

"এ শিরোনামের মাধ্যমে তিনি যারা রোজাদারের জন্য কাঁচা মিসওয়াক করাকে মাকরুহ মনে করেন ইঙ্গিতে তাদের মতের প্রত্যুত্তর দিয়েছেন।"

এক্ষেত্রে তিনি রোজাদারকে অন্য কারো থেকে আলাদা করেননি। যেমনিভাবে কাঁচা মিসওয়াক থেকে শুকনো মিসওয়াককে আলাদা করেননি। শিরোনামকে এভাবে গ্রহণ করলে এ শিরোনামের অধীনে যে কয়টি হাদিস উল্লেখ করেছেন সবগুলোর সাথে শিরোনামের সামঞ্জস্যতা ফুটে উঠে। আর এ সবগুলো বিধানকে অন্তর্ভুক্তকারী বাণীটি আবু হুরায়রা (রাঃ) এর হাদিসে এসেছে- "তিনি তাদেরকে প্রত্যেক ওজুর সময় মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতেন।" এ কথাটির দাবী হচ্ছে- প্রত্যেক সময় ও প্রত্যেক অবস্থায় মিসওয়াক করা জায়েয।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন: সঠিক মতানুযায়ী দিবসের প্রথমভাগে হোক বা শেষভাগে হোক রোজাদারের জন্য মিসওয়াক করা সুন্নত।[ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম, পৃষ্ঠা- ৪৬৮]

মিসওয়াক কাঁচা হলেও দিনের যে কোন সময় মিসওয়াক করা সুন্নত। যদি রোজাদার মিসওয়াক করে এবং মিসওয়াককালে ঝাঁঝ অনুভব করে বা এ জাতীয় কোন স্বাদ অনুভব করে এবং সেটা গিলে ফেলে অথবা থুথুসহ মুখ থেকে মিসওয়াক বের করে আবার মুখে দেয় এবং থুথু গিলে ফেলে এতে করে রোজার কোন ক্ষতি হবে না।[আল-ফাতাওয়া আল-সাদিয়া, পৃষ্ঠা- ২৪৫] আল্লাহই ভাল জানেন।সূত্র: ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

রোযা-বিনষ্টকারী বিষয়গুলো দুইভাগে বিভক্ত:

কিছু রোযা-বিনষ্টকারী বিষয় রয়েছে যেগুলো শরীর থেকে কোন কিছু নির্গত হওয়ার সাথে সম্পৃক্ত। আর কিছু রোযা-বিনষ্টকারী বিষয় আছে যেগুলো শরীরে প্রবেশ করানোর সাথে সম্পৃক্ত।

রোযা নষ্টকারী বিষয় ৭টি; সেগুলো হচ্ছে-

১। সহবাস
২। হস্তমৈথুন
৩। পানাহার
৪। যা কিছু পানাহারের স্থলাভিষিক্ত
৫। শিঙ্গা লাগানো কিংবা এ জাতীয় অন্য কোন কারণে রক্ত বের করা
৬। ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করা
৭। মহিলাদের হায়েয ও নিফাসের রক্ত বের হওয়া

রোযার ফিদইয়াঃ প্রতিদিনের পরিবর্তে একজন মিসকীন খাওয়াতে হবে, যার পরিমাণ হল দেশীয় খাদ্যদ্রব্য যেমন খেজুর বা অন্য কোন খাদ্যের অর্ধ স্বা'। আপনি যদি ছুটে যাওয়া দিনগুলোর সম সংখ্যক দিন একজন মিসকীনকে রাতের বা দুপুরের খাবার খাইয়ে থাকেন তবে তা যথেষ্টহবে। কিন্তু অর্থদানের মাধ্যমে ফিদিয়া দিলে সেটা যথেষ্ট হবে না। অর্ধ স্বা প্রায় ১.৫ কিঃগ্রাঃ এর সমান।

রোযার কাফফারা: একজন কৃতদাস আযাদ করা। কৃতদাস না পেলে লাগাতর দুইমাস রোযা রাখা। সেটাও করতে না পারলে ষাটজন মিসকীনকে খাবার খাওয়ানো।

আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন:একবার আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। এ সময় দুইজন মানুষ এসে আমার দুইবাহু ধরে আমাকে দুর্গম পাহাড়ে নিয়ে গেলো। সেখানে নিয়ে তারা আমাকে বলল: পাহাড়ে উঠুন।আমি বললাম:আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তারা বলল: আমরা আপনার জন্য সহজ করে দিচ্ছি।তাদের আশ্বাস পেয়ে আমি উঠতে লাগলাম এবং পাহাড়ের চূড়া পর্যন্ত উঠে গেলাম। সেখানে প্রচণ্ড চিৎকারের শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম: এটা কিসের শব্দ? তারা বলল: এটা জাহান্নামী লোকদের চিৎকার।

এরপর তারা আমাকে এমন কিছু লোকদের কাছে নিয়ে এল যাদেরকে পায়ের টাখনুতে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। তাদের গাল ছিন্নবিন্ন, তা হতে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম: এরা কারা? তিনি বললেন: এরা হচ্ছে এমন রোজাদার যারা রোজা পূর্ণের আগে ইফতার করত।"

শাইখ আল-আলবানী 'সহীহ মাওয়ারিদ আজ-যামআন'(১৫০৯) গ্রন্থে হাদিসটিকে সহীহ আখ্যায়িত করেন এবং হাদিসটির শেষে টীকা লিখে বলেন:"আমি বলি –এই শাস্তি হল তাঁর জন্য যে রোজা রেখেছে; কিন্তু ইফতারের সময় হওয়ার পূর্বে ইচ্ছাকৃতভাবে ইফতার করে ফেলেছে।

সুতরাং যে ব্যক্তি মূলতই রোজা রাখেনি তার অবস্থা কি হতে পারে?!

১মঃ সহবাসঃ

স্ত্রী সহবাস ছাড়া অন্য কোন কারণে কাফফারা আদায় করা ওয়াজিব হয় না।

তওবা করা, সেদিনের রোযা পূর্ণ করা, পরবর্তীতে এ দিনের রোযা কাযা করা ও কঠিন কাফফারা আদায় করা ফরয। কাফফারা আদায় করতে হবে—ক) ক্রীতদাস আযাদ, খ)লাগাতার দুই মাস রোযা রাখা, গ) ষাটজন মিসকীনকে খাওয়ানো

২য়ঃ হস্তমৈথুনঃ

তওবা করা, সে দিনের বাকী সময় উপবাস থাকা এবং পরবর্তীতে সে রোযাটির কাযা পালন করা(বীর্যপাত হলে)

কিডনী ডায়ালাইসিস এর ক্ষেত্রে রোগীর শরীর থেকে রক্ত বের করে সে রক্ত পরিশোধন করে কিছু কেমিক্যাল ও খাদ্য উপাদান (যেমন— সুগার ও লবণ ইত্যাদি) যোগ করে সে রক্ত পুনরায় শরীরে পুশ করা হয়; এতে করে রোযা ভেঙ্গে যাবে।[ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্র (১০/১৯)]

তৃতীয়: পানাহার।

পানাহার বলতে বুঝাবে— মুখ দিয়ে কোন কিছু পাকস্থলীতে পৌঁছানো। অনুরূপভাবে নাক দিয়ে কোন কিছু যদি পাকস্থলীতে পৌঁছানো হয় সেটাও পানাহারের পর্যায়ভুক্ত। এ কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "তুমি ভাল করে নাকে পানি দাও; যদি না তুমি রোযাদার হও।"[সুনানে তিরমিযি (৭৮৮), আলবানি সহিহ তিরমিযিতে হাদিসটিকে সহিহ আখ্যায়িত করেছেন]

চতুর্থ: যা কিছু পানাহারের স্থলাভিষিক্ত।

এটি দুইটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে।

১. যদি রোযাদারের শরীরে রক্ত পুশ করা হয়।যেমন- আহত হয়ে রক্তক্ষরণের কারণে কারো শরীরে যদি রক্ত পুশ করা হয়; তাহলে সে ব্যক্তির রোযা ভেঙ্গে যাবে। যেহেতু পানাহারের উদ্দেশ্য হচ্ছে— রক্ত তৈরী।

২. খাদ্যের বিকল্প হিসেবে ইনজেকশন পুশ করা। কারণ এমন ইনজেকশন নিলে পানাহারের প্রয়োজন হয় না।

তবে

যেসব ইনজেকশন পানাহারের স্থলাভিষিক্ত নয়; বরং চিকিৎসার জন্য দেয়া হয়, উদাহরণতঃ ইনসুলিন, পেনেসিলিন কিংবা শরীর চাঙ্গা করার জন্য দেয়া হয় কিংবা টীকা হিসেবে দেয়া হয় এগুলো রোযা ভঙ্গ করবে না;

পঞ্চম: শিঙ্গা লাগানোর মাধ্যমে রক্ত বের করা।

দলিল হচ্ছে— নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: "যে ব্যক্তি শিঙ্গা লাগায় ও যার শিঙ্গা লাগানো হয় উভয়ের রোযা ভেঙ্গে যাবে।"[সুনানে আবু দাউদ (২৩৬৭), আলবানী সহিহ আবু দাউদ গ্রন্থে (২০৪৭) হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন

রক্ত দেয়াও শিঙ্গা লাগানোর পর্যায়ভুক্ত। কারণ রক্ত দেয়ার ফলে শরীরের উপর শিঙ্গা লাগানোর মত প্রভাব পড়ে। তাই রোযাদারের জন্য রক্ত দেয়া জায়েয নেই। তবে যদি অনন্যোপায় কোন রোগীকে রক্ত দেয়া লাগে তাহলে রক্ত দেয়া জায়েয হবে। রক্ত দানকারীর রোযা ভেঙ্গে যাবে এবং সে দিনের রোযা কাযা করবে।[শাইখ উছাইমীনের 'মাজালিসু শারহি রামাদান' পৃষ্ঠা-৭১]

কোন কারণে যে ব্যক্তির রক্ত ক্ষরণ হচ্ছে— তার রোযা ভাঙ্গবে না; কারণ রক্ত ক্ষরণ তার ইচ্ছাকৃত ছিল না।[স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্র (১০/২৬৪)]

আর দাঁত তোলা, ক্ষতস্থান ড্রেসিং করা কিংবা রক্ত পরীক্ষা করা ইত্যাদি কারণে রোযা ভাঙ্গবে না; কারণ এগুলো শিঙ্গা লাগানোর পর্যায়ভুক্ত নয়।

ষষ্ঠ: ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করা।

"যে ব্যক্তির অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি এসে যায় তাকে উক্ত রোযা কাযা করতে হবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় বমি করল তাকে সে রোযা কাযা করতে হবে"[সুনানে তিরমিযিঃ ৭২০, আলবানী সহিহ তিরমিযি গ্রন্থে (৫৭৭) হাদিসটিকে সহিহ আখ্যায়িত করেছেন

ইবনে মুনযির বলেন: যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত বমি করেছে আলেমদের ঐক্যবদ্ধ অভিমত (ইজমা) হচ্ছে তার রোযা ভেঙ্গে গেছে।[আল-মুগনী (৪/৩৬৮)]

সপ্তম: হায়েয ও নিফাসের রক্ত নির্গত হওয়া।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যখন মহিলাদের হায়েয হয় তখন কি তারা নামায ও রোযা ত্যাগ করে না!?" সহিহ বুখারীঃ ৩০৪

তাই কোন নারীর হায়েয কিংবা নিফাসের রক্ত নির্গত হওয়া শুরু হলে তার রোযা ভেঙ্গে যাবে; এমনকি সেটা সূর্যাস্তের সামান্য কিছু সময় পূর্বে হলেও। আর কোন নারী যদি অনুভব করে যে, তার হায়েয শুরু হতে যাচ্ছে; কিন্তু সূর্যাস্তের আগে পর্যন্ত রক্ত বের হয়নি তাহলে তার রোযা শুদ্ধ হবে এবং সেদিনের রোযা তাকে কাযা করতে হবে না।

আর হায়েয ও নিফাসগ্রস্ত নারীর রক্ত যদি রাত থাকতে বন্ধ হয়ে যায় এবং সাথে সাথে তিনি রোযার নিয়ত করে নেন; তবে গোসল করার আগেই ফজর হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আলেমদের মাযহাব হচ্ছে— তার রোযা শুদ্ধ হবে।

মুসাফিরের জন্য নিম্নোক্ত স্থানে রোযা ভঙ্গ করা হারাম:

১। যদি তার সফর নামায কসর করার সমান দূরত্বে না হয়।
২। অধিকাংশ আলেমের মতে, যদি তার সফর কোন বৈধ কারণের পরিপ্রেক্ষিতে না হয়।
৩। যদি সে রোযা ভঙ্গ করার জন্য সফর করে।
৪। যদি সে সফর শুরু করে, কিন্তু তার গ্রামের বাড়ী-ঘর কিংবা তার শহর অতিক্রমের আগেই রোযা ভেঙ্গে ফেলতে চায়।
৫। অধিকাংশ আলেমের মতে, পঞ্চম অবস্থা হচ্ছে– যদি কেউ যে স্থানের উদ্দেশ্যে সফর করেছে সে স্থানে পৌঁছে যায় এবং সেখানে চারদিনের বেশি থাকার নিয়ত করে। অন্য একদল আলেমের মতে, মুসাফির ব্যক্তি যতদিন মুসাফির অবস্থায় থাকবে ততদিন তিনি সফরের ছাড়গুলো গ্রহণ করতে পারবেন, সে অবস্থান যত লম্বা সময় হোক না কেন।

আল্লাহ্ই ভাল জানেন। সূত্র: ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

শাইখ উছাইমীনকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল (ফাতাওয়াস সিয়াম পৃষ্ঠা-১৬২):
গর্ভবতী নারী যদি নিজের স্বাস্থ্যহানি বা সন্তানের স্বাস্থ্যহানির আশংকায় রোজা না রাখে এর কী হুকুম?
উত্তরে তিনি বলেন: "আমাদের জবাব হচ্ছে- গর্ভবতী নারীর দুইটি অবস্থার কোন একটি হতে পারে:

১. শারীরিকভাবে শক্তিশালী ও কর্মোদ্যমী হওয়া, রোজা রাখতে কষ্ট না হওয়া, গর্ভস্থিত সন্তানের উপর কোন প্রভাব না পড়া- এ নারীর উপর রোজা রাখা ফরজ। যেহেতু রোজা ছেড়ে দেয়ার জন্য তার কোন ওজর নেই।

২. গর্ভবতী নারী রোজা রাখতে সক্ষম না হওয়া: গর্ভ ধারণের কাঠিন্যের কারণে অথবা তার শারীরিক দুর্বলতার কারণে অথবা অন্য যে কোন কারণে। এ অবস্থায় এ নারী রোজা রাখবে না। বিশেষতঃ যদি তার গর্ভস্থিত সন্তানের ক্ষতির আশংকা করে সেক্ষেত্রে রোজা ছেড়ে দেয়া তার উপর ফরজ। যদি সে রোজা ছেড়ে দেয় তাহলে অন্য ওজরগ্রস্ত ব্যক্তিদের যে হুকুম তার ক্ষেত্রেও একই হুকুম হবে তথা পরবর্তীতে এ রোজাগুলো কাযা পালন করা তার উপর ফরজ। অর্থাৎ সন্তান প্রসব ও নিফাস থেকে পবিত্র হওয়ার পর এ রোজাগুলো কাযা পালন করা তার উপর ফরজ। তবে কখনো হতে পারে গর্ভধারণের ওজর থেকে সে মুক্ত হয়েছে ঠিক; কিন্তু নতুন একটি ওজরগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, অর্থাৎ দুগ্ধপান করানোর ওজর। দুগ্ধপানকারিনী নারী পানাহার করার মুখাপেক্ষী হয়ে পড়তে পারে; বিশেষতঃ গ্রীষ্মের দীর্ঘতর ও উত্তপ্ত দিনগুলোতে। এ দিনগুলোতে এমন নারী তার সন্তানকে বুকের দুধ পান করানোর জন্য রোজা ছেড়ে দেয়ার প্রয়োজন হতে পারে। এমতাবস্থায় আমরা সে নারীকে বলব: আপনি রোজা ছেড়ে দিন। এ ওজর দূর হওয়ার পর আপনি এ রোজাগুলো কাযা পালন করবেন।" সমাপ্ত
স্থায়ী কমিটির ফতোয়াতে (১০/২২৬) এসেছে-
"গর্ভবতী নারীর উপরও রোজা রাখা ফরজ; তবে যদি রোজা রাখলে নিজের স্বাস্থ্যহানি অথবা গর্ভস্থিত সন্তানের স্বাস্থ্যহানির আশংকা হয় তাহলে তার জন্যে রোজা না-রাখার অবকাশ থাকবে এবং প্রসব করার পর নিফাস থেকে পবিত্র হয়ে এ রোজাগুলো কাযা করবে।" সমাপ্ত

সূত্র: ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

রোগীর জন্য যদি রোযা রাখা কষ্ট হয় তাহলে উত্তম হল রোযা না-রাখা এবং যে দিনগুলোর রোযা রাখেনি সেগুলোর কাযা পালন করা। কষ্ট করে রোযা রাখা মুস্তাহাব নয়। দলিল হচ্ছে—

১। ইমাম আহমাদ (৫৮৩২) ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁর রুখসতগুলো গ্রহণ করাকে পছন্দ করেন যেভাবে তিনি তাঁর অবাধ্যতায় লিপ্ত হওয়াকে অপছন্দ করেন।"(আলাবানী "ইরওয়াউল গালিল" গ্রন্থে (৫৬৪) হাদিসটিকে সহিহ বলেন"

২। আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন: "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দুটো বিষয়ের মাঝে নির্বাচন করার এখতিয়ার দেয়া হলে তিনি সহজতম বিষয়টি গ্রহণ করতেন; যতক্ষণ না সেটা পাপ হত। পাপ হলে তিনি হতেন এর থেকে সবচেয়ে দূরত্ব রক্ষাকারী ব্যক্তি।" সহিহ বুখারীঃ ৬৭৮৬ ও সহিহ মুসলিমঃ ২৩২৭

ইমাম নববী বলেন: "এ হাদিসে সহজতম বিষয় ও কোমলতম বিষয় গ্রহণ করা মুস্তাহাব হওয়ার পক্ষে দলিল রয়েছে; যতক্ষণ না সেটা হারাম হয় কিংবা মাকরুহ হয়।"[সমাপ্ত]

বরং কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও রোযা রাখা মাকরুহ। কখনও কখনও হারাম হতে পারে; যদি রোযার কারণে শারীরিক ক্ষতি হওয়ার আশংকা হয়। কুরতুবী বলেন (২/২৭৬): "রোগীর অবস্থা দুটো:

১। মোটেই রোযা রাখার সক্ষমতা না থাকা; তার জন্য রোযা না-রাখা ওয়াজিব।

২। কিছু শারীরিক ক্ষতি ও কষ্টের সাথে রোযা রাখতে সক্ষম হওয়া। এ ব্যক্তির জন্য রোযা না-রাখা মুস্তাহাব। এমতাবস্থায় কেবল অজ্ঞ লোকই রোযা রাখে।"[সমাপ্ত]

ইবনে কুদামা (রহঃ) "আল-মুগনী" গ্রন্থে (৪/৪০৪) বলেন: "যদি রোগী এ রোগ সত্ত্বেও কষ্ট করে রোযা রাখে তাহলে সে মাকরুহ কাজে লিপ্ত হল। যেহেতু এ রোযা রাখার মধ্যে নিজের শারীরিক ক্ষতি করা নিহিত আছে। রোযা না-রাখাটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে শিথিলায়ন ও আল্লাহ্‌র দেয়া অবকাশকে গ্রহণ করা।"[সমাপ্ত]

শাইখ বিন উছাইমীন (রহঃ) "আশ-শারহুল মুমতি" গ্রন্থে (৬/৩৫২) বলেন:

"এর মাধ্যমে আমরা কিছু কিছু ইজতিহাদকারী ও রোগীদের ভুল জানতে পারি যাদের রোযা রাখতে কষ্ট হয়; হয়তোবা শারীরিক ক্ষতিও হয় কিন্তু তারা রোযা ভাঙ্গতে অস্বীকৃতি জানান। আমরা বলব: উনারা ভুল করছেন; যেহেতু তারা আল্লাহ্‌র দেয়া বদান্যতাকে গ্রহণ করেননি এবং তাঁর দেয়া অবকাশকে গ্রহণ করেননি এবং নিজেদের ক্ষতি করেছেন। অথচ আল্লাহ্ তাআলা বলছেন: "তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না।" সূরা নিসা: ২৯

আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ। সূত্র: ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

যেসব দেশে রাত বা দিন ২৪ ঘন্টারও বেশি সময়ে প্রলম্বিত, সেসব দেশে কীভাবে সাওম পালন করতে হবে?

পর্যালোচনা: এসব দেশে যে সময় হিসাব করে সালাতের সময় নির্ধারণ করতে হবে, সে বিষয়ে উলামায়ে কেরামের মধ্যে কোনো মতভেদ নেই। নাউওয়াস ইবন সাম'আন রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন,

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করলেন। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! পৃথিবীতে সে কতদিন অবস্থান করবে? তিনি বললেন, ৪০ দিন। প্রথম দিন এক বছরের সমান, দ্বিতীয় দিন এক মাসের সমান এবং তৃতীয় দিন এক সপ্তাহের সমান। আর বাকী দিনগুলো তোমাদের দিনগুলোর মতোই। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! যে দিনটি এক বছরের সমান হবে, সে দিনে আমাদের একদিনের সালাত কি যথেষ্ট হবে? তিনি বললেন, না। তোমরা ঐদিনের হিসাব করবে।" সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৯৩৭

সময় হিসাব করে সালাত ও সাওমের সময় নির্ধারণের ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম একমত হলেও কীভাবে সময় নির্ধারণ করতে হবে, সে ব্যাপারে তাদের মধ্যে তিনটি মত পাওয়া যায়:

প্রথম মত: বেশিরভাগ ওলামায়ে কেরামের মতে, ঐসব দেশের সবচেয়ে কাছাকাছি যেসব দেশে রাত-দিনের স্বাভাবিক আবর্তন ঘটে এবং শরী'আত নির্ধারিত আলামত অনুযায়ী সালাত ও সাওমের সময় জানা যায়, সেসব দেশের হিসাব অনুযায়ী সময় নির্ধারণ করতে হবে। 'রাবেত্বাতুল আলাম আল-ইসলামী'-এর প্রতিষ্ঠান 'ইসলামী ফিকহ একাডেমী' এই মতের পক্ষাবলম্বন করেছে। সঊদী আরবের উচ্চ উলামা পরিষদও এজাতীয় মত প্রকাশ করেছে।

দ্বিতীয় মত: স্বাভাবিক হিসাব অনুযায়ী সময় নির্ধারণ করতে হবে। অর্থাৎ রাতকে ১২ ঘন্টা এবং দিনকে ১২ ঘন্টা হিসাব করতে হবে। হাম্বলী মাযহাবের কোনো কোনো আলিম এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তারা বলেন, যেহেতু ঐসব দেশে স্বাভাবিক সময় অনুযায়ী রাত-দিন হয় না, সেহেতু সেগুলোতে মধ্যমপন্থী কোনো এলাকার সময় অনুযায়ী সময় নির্ধারণ করতে হবে। ঠিক ইস্তেহাযাগ্রস্ত নারীর মতো, যার হায়েযের সময়ের নির্ধারিত কোনো সময়সীমা নেই এবং সে রক্ত দেখে হায়েয ও ইস্তেহাযার মধ্যে পার্থক্য করতে অক্ষম। (তাকে যেমন মধ্যম সময় অর্থাৎ সর্বোচ্চ সময় হায়েয হিসেবে ধরে বাকী সময় সালাত আদায় করতে হয় তেমনি এ ব্যক্তিরাও তাই করবে)।

তৃতীয় মত: কতিপয় ফকীহের মতে, মক্কার সময় অনুযায়ী সময় নির্ধারণ করতে হবে। কেননা মক্কা হচ্ছে 'উম্মুল ক্বুরা' বা জনপদসমূহের মা এবং মুসলিমদের কিবলা, সেখান থেকে ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়েছে।

মাসআলাটির দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ যেসব দেশে রাত-দিন ২৪ ঘন্টায় হয়, কিন্তু রাত-দিনের কোনো একটি খুব বেশি সময় পর্যন্ত লম্বা হয়, সেসব দেশের সাওমের ধরণ নিয়ে ওলামায়ে কেরামের দুই রকম মত পাওয়া যায়:

প্রথম মত: দিন অত্যধিক লম্বা হোক বা অত্যধিক খাঁটো হোক ফজর উদয় হওয়া থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সাওম পালন করা এসব দেশের বাসিন্দাদের ওপর ওয়াজিব। তবে দিন যদি অত্যধিক লম্বা হয় এবং কেউ অসুস্থতার কারণে সাওম পালনে অক্ষম হয়, বা তার অসুখ বেড়ে যায়, বা আরোগ্য লাভের গতি মন্থর হয়ে যায়, অথবা বার্ধক্যজনিত কারণে বা অন্য কোনো কারণে সাওম পালনে অক্ষম হয়, তাহলে সে সাওম ছেড়ে দিবে এবং পরবর্তীতে কাযা আদায় করবে।

'রাবেত্বাতুল আলাম আল-ইসলামী'-এর প্রতিষ্ঠান 'ইসলামী ফিকহ একাডেমী' এবং সঊদী আরবের উচ্চ উলামা পরিষদ এই মতের পক্ষাবলম্বন করেছে। তারা বলেন, শরী'আতের বিধান সব দেশের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيۡلِۚ﴾ [البقرة: ١٨٧]

"আর পানাহার কর যতক্ষণ না কালো রেখা থেকে ভোরের শুভ্র রেখা পরিষ্কার দেখা যায়। অতঃপর রাত পর্যন্ত সাওম পূর্ণ কর"। [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৮৭] শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালেহ আল-উসাইমীন রহ. বলেন, 'যদি সেখানে রাত ও দিন হয়ে থাকে, তাহলে লম্বা হোক বা খাঁটো হোক রাত ও দিন ধর্তব্য হবে। এমনকি যদি ধরে নেওয়া হয়, রাত ৪ ঘন্টা এবং দিন ২০ ঘন্টা, তবুও রাতকে রাত এবং দিনকে দিন ধরতে হবে। তবে যদি সেখানে রাত ও দিনের ব্যাপার না থাকে, তাহলে সময় হিসাব করতে হবে। যেমন, সুমেরু ও কুমেরুর অঞ্চলসমূহ।

দ্বিতীয় মত: দিন বা রাত যেহেতু অত্যধিক লম্বা, সেহেতু হিসাব করে সময় নির্ধারণ করতে হবে। তবে সময় নির্ধারণের পদ্ধতি কী হবে তদ্বিষয়ে তারা মতভেদ করেছেন। তাদের কেউ কেউ বলেছেন, মক্কার সময় অনুযায়ী রাত-দিনের সময় নির্ধারণ করতে হবে। মিশরের আল-আযহারের ফাতওয়া বোর্ড এবং জর্ডানের ফাতওয়া বোর্ড এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছে।আবার কেউ কেউ বলেছেন, তাদের সবচেয়ে কাছাকাছি যেসব দেশে রাত ও দিন স্বাভাবিক গতিতে আবর্তিত হয়, সেসব দেশের সময় অনুযায়ী তারা সময় নির্ধারণ করবে।

জাযাকুমুল্লাহি খাইরান
ফিদদুনইয়া
ওয়াল
আখিরাত

جزاكم الله خيرا